Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-II, October 2017, Page No. 32-40
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

‘ছোট’-র ভাববৃত্তে ‘বড়’-র মনন : নির্বাচিত কবিতায় নীরেন্দ্রনাথ

ড. অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়, উত্তর চব্বিশ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

Nirendrnath Chakroborty is one of the great poet of modern bengali literature. He has shown various aspects of our society through his poems. Some of his poems were also written for the teenagers. In contrary, the basic surroundings of beautiful nature and the rapid changes of family atmosphere makes the ultimate outlook of a child in his or her childhood and Niendranath wants to show of those ultimate changes in various way with some broader perspectives of imaginations and ideas applicable to our adult intelectuality. His poems written for teenager group like ‘sonali brittye’, ‘mather sondhya’, ‘sandhya tamasha’, ‘nijer bari, ‘khukur jonno’ etc. are the compositions which search many mature thoughts in the lime light of childish cognitions.

Key Wods: Nirendranath Chakroborty, Modern Bengali Poem, Beautiful Nature, Family Atmosphere, Rapid Change, Mature Thought, Childish Cognition.

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভুত ও গত সাত দশক ধরে বাংলা কবিতায় অনন্য আভিজাত্যে বিরাজ করছেন কবি ও ছোটগল্পকার নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী (১৯ অক্টোবর ১৯২৪)। বিরানব্বই-এ পা রাখা প্রবীণতম এই কবি বাংলার কবিতাজগতে আজ অভিভাবকপ্রতিম। ‘উলঙ্গ রাজা’ কাব্যগ্রন্হ লেখার জন্য ১৯৭৪ সালে প্রাপ্ত সাহিত্য আকাদেমী, তারাশঙ্কর-স্মৃতি, আনন্দ শিরোমণি সহ বহু পুরস্কারে ভুষিত, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির সাথে দীর্ঘকাল যুক্ত এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধিতে সম্মানীত কবি বয়সকে উপেক্ষা করে সৃজনশীল সাহিত্য ও দেশ-কাল-সমাজ সম্পর্কে আজও সমানভাবে সচেতন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হলোঃ অন্ধকার বারান্দা (১৩৬৭),আজ সকালে (১৯৭৮), আর রঙ্গ (১৯৯১),উলঙ্গ রাজা (১৯৭১),কবিতার বদলে কবিতা (১৩৮৩), কলকাতার যীশু (১৩৭৬), খোলা মুঠি (১৩৮১), ঘুমিয়ে পড়ার আগে (১৯৮৭),ঘর দুয়ার (১৯৮৩), চল্লিশের দিনগুলি (১৯৯৪), যাবতীয় ভালোবাসাবাসি (১৩৯২), নক্ষত্র জয়ের জন্য (১৩৭৬), নীরক্ত করবী (১৩৭১), নীলনির্জন (১৩৬১), পাগলা ঘন্টি (১৩৮৭), সত্য সেলুকাস (১৯৯৫), সময় বড় কম (১৩৯০) ইত্যাদি। তাঁর অন্যতম উপন্যাস ‘পিতৃপুরুষ’ ও আত্মজীবনী ‘নীরবিন্দু’ জনপ্রিয়তার শিখর স্পর্শ করেছে।

বড়দের পাশাপাশি ছোটদের জন্যে লেখা বাংলা কবিতায় অনন্যতার নজির গড়েছেন নীরেন্দ্রনাথ। তাঁর নিজের শৈশবের পুরোটাই কেটেছিল পূর্ববঙ্গে, ঠাকুরদা আর ঠাকুমার কাছে। কবির ঠাকুরদা তাঁর প্রথম কর্মজীবন কাটিয়েছিলেন কলকাতায়। কর্মজীবন শেষে প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সে কলকাতার পাট চুকিয়ে বাংলাদেশের ফরিদপুরের বাড়ি চান্দ্রা গ্রামে চলে আসেন তিনি। তাঁর বাবা তখন কলকাতাতেই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করছেন। দু’বছর বয়সে কবির মা-ও তাঁর বাবার কর্মস্থল—কলকাতায় চলে যান। কবি

থেকে যান ঠাকুরদা লোকনাথ চক্রবর্তীর কাছে। গ্রাম-জীবনে কবির ছিল অবাধ স্বাধীনতা—ইচ্ছেমতো দৌড়ঝাঁপ করে কাটাতেন তিনি দিনের অনেকটা সময়। কখনো গাছে উঠেছেন; আবার কখনো আপন মনে ঘুরেছেন গ্রামের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে। চার বছর বয়সেই মুখস্থ করেছিলেন গ্রামের কবিয়ালদের মুখে মুখে বলা কবিগান, রামায়ণ গান। গ্রামের সেই সুন্দর দিনগুলো একসময় তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল ছোটদের জন্য লেখা নানা কবিতা আর গল্প রচনায়। তবে শুধু প্রকৃতিই নয়, তার সাথে সাথে স্মৃতি, অনুভব আর দেশ-কাল সহ বৃহত্তর ভাবনার ভাববৃত্তে নীরেন্দ্রনাথ কখনো কখনো আনতে চেয়েছেন ছোটদের। তাই কিশোর-কিশোরীরা তাঁর কবিতা পড়ে শুধু আনন্দই পায় না, বরং কবি-ভাবনার অনুসৃত পথ ধরে তারা হয়ে ওঠে আরো অনেক বৃহত্তর ভাবনার শরিক। নীরেন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থ থেকে আমার নির্বাচন করা কিছু কবিতায় আমি তেমনভাবেই দেখাতে চেয়েছি ছোটদের ভাবমণ্ডলে বিরাজিত এক কবিকে। তেমনই এক কবি, যাঁর কবিতায়—ছোটদের ভাববৃত্তের আবহে থেকে কবির আত্ম অনুসন্ধানে উঠে আসতে চায় সেই সব অনাগত অথচ পরিণত ভবিষ্যত উত্তরসূরীরা, কবিতার কায়ায় যারা ধারণ করে আছে আজকের কবির বীজানুভূতিগুলিকে।

নীরেন্দ্রনাথের লেখা 'অন্ধকার বারান্দা' (১৩৬৭) কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা হলো 'সোনালী বৃত্তে'। কবিতাটি নদী, পাখি, কচি পাতায় হাওয়ার নৃত্য আর আলোর বৃত্তে—চলমান জীবনের এক গতিরেখা মনে এঁকে দিয়ে যায়। সকাল, দুপুর আর সন্ধ্যারা এখানে পার্থিব বাস্তব আর কল্পময় স্বপ্নসম্ভাবনা নিয়ে জেগে থাকে মনের রাজ্যে। কবির ভাষায়ঃ 'একটুখানি কাছে এসেই দূরে যায়/নোয়ানো এই ডালের'পরে/একটু বসেই উড়ে যায়।/এই তো আমার বিকেলবেলার পাখি।/সোনালি এই আলোর বৃত্তে/থেমে থাকি,/অশথ গাছের কচি পাতায় হাওয়ার নৃত্যে/দৃষ্টি রাখি।/একটু থামি,একটু দাঁড়াই,/একটু ঘুরে আসি আবার।... .../দুপুরবেলার দৃশ্য নদী হারিয়ে যায় বারে বারে/সন্ধ্যাবেলার অন্ধকারে।/তবু আবার/ সময় আসে নদীর স্বপ্নে ফিরে যাবার।/নদীও যে পাখির মতোই,কাছের থেকে দূরে যায়,/মনের কাছে বাঁক নিয়ে সে ঘুরে যায়।' ছোটদের ভাবনায় প্রকৃতি আর বহমান জীবনকে এমনভাবে মিলিয়ে দেওয়া বোধহয় কবি নীরেন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব।

একই কাব্যগ্রন্থের 'সান্ধ্য তামাশা' কবিতায় কবি 'পশ্চিম দুয়ারে'-র সূর্যাস্তকে 'আকাশের শান্ত রাজধানী'-তে এক সান্ধ্য তামাশার ভেল্কিবাজি রূপে দেখতে চান। এ যেন অগ্নিদেহী সূর্যের এক অন্তিম চাতুরী। কবির ভাষায়ঃ 'হা-রে হা-রে হা-রে, দ্যাখো, হা-রে,/কী জমাট সান্ধ্য তামাশায়/আকাশের পশ্চিম দুয়ারে/সূর্য তার ডুগডুগি বাজায়।' কিন্তু কবির ভাবতন্ত্রীতে রণিত শব্দবন্ধের আড়ালে যে আসল চাতুরীটি রক্ষিত আছে তাকে বেশ বোঝা যায় কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকে যেখানে তিনি বলেনঃ 'দ্যাখো রে পুঞ্জিত মেঘে-মেঘে/চিত্রিত অলিন্দে ঝরোকায়/রঙের সংহত ছোঁয়া লেগে/সারি বেঁধে ও কারা দাঁড়ায়।/ও কারা কৌতুকে ঠোঁট চেটে/সায়াহ্নের সংবৃত আবেগে/দ্যাখে ভেল্কিবাজের চাতুরি;/কী করে সে শূন্যে জাল বেয়ে/নিখিল সন্ধ্যায় করে চুরি/নানাবর্ণ মাছের সম্ভার।/দর্শকেরা রয়েছে তাকিয়ে,/তবু কিছু লজ্জা নেই তার।' 'নিঃসঙ্গ বিহ্বল' পাখির এক মুহূর্তে 'বিদ্যুত-গতিতে ছুটে এসে' যেন 'মায়ামন্ত্রবলে' সূর্যরূপ 'অথই লাল জলে' ডুবে মরা কিম্বা 'নিঃশব্দ ভীষন কোলাহলে' মেঘেদের দৌড়—সবই যেন সেই অন্তিম তামাশার ছলে ঘটে চলা মানুষেরই ভাবনার বুদবুদ। আসলে কবিতাটি আখরে আখরে ছোটদের সেইমাত্র বুঝিয়ে দেওয়া—যেন শুধুই রোমান্টিক মোহমুদ্গারে আকীর্ণ হয়না তাদের শৈশব, বর্ণিল নিখিল সন্ধ্যায়—সূর্য তার প্রাত্যলীলা করে যাবে বিপুল প্রয়াসে। আবেগে আশ্লিষ্ট নর-নারী শুধু তারই এক রূপ—সান্ধ্যকালিক ঐ বর্ণের বিলাসকে দেখে আতিশয্যে হয় মাতোয়ারা। সে সনাতনী সন্ধ্যা বর্ণিত হয় শুধু মানবেরই নানা নিজস্ব ভাবনায়, সূর্যের তাতে নেই কোনো দায়। বরং লজ্জাহীন মানুষের দল রোমান্টিক মোহে, আবেগ-বিহ্বলতায়, কাব্যে-ভাবাবেশে, বর্ণে-ছন্দে, কত না ব্যঞ্জনা-বিশ্লেষণে করে সেই সূর্যাস্তের বর্ণিল বয়ান। মানুষের অন্ধ ও অন্তঃসারশূণ্য ভাববিলাসিতা ও চূড়ান্ত রোমান্টিকতার সুলভ মোহকেই এখানে প্রকৃত অর্থে 'সান্ধ্য তামাশা' বলতে চান কবি, যাকে ব্যঙ্গাত্মক ভাবনায় ছোটদের মনের মাঝে পৌঁছে দিতে চান। সেই বার্তার মধ্যে দিয়ে যেন তাদের আরো বেশি করে

বাস্তববাদী করে তুলতে চান—ছোটদের ভাববৃত্তে থেকে চেতনার আলোয় তাদের করে তুলতে চান আরো বেশি বড়। 'কবিতা কল্পনালতা'য় যে সত্যিই বিশ্বাসী ছিলেন না কবি নীরেন্দ্রনাথ তা আরও একবার এ কবিতায় প্রমাণিত হয়।

কবির লেখা 'মাঠের সন্ধ্যা' কবিতাটিও 'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। এ কবিতাটিতেও ছোটদের ভাববৃত্তের আড়াল থেকে বড়ো জীবনকে তুলে ধরতে চান কবি। কবিতাটিতে তিনি প্রকৃতির অনুষঙ্গে হারানোর বেদনাকে জাগিয়ে তুলতে চান। চার স্তবকের এই কবিতার দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ—এই তিনটি স্তবকে যথাক্রমে নদী, তারা ও পাখিকে 'রহস্যময়' বলেছেন কবি। আসলে এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে সময়ের চলা-ফেরা আর হারানো অস্ফুট অতীতের জন্য সঞ্চিত কবি-মনের বিমূর্ত বেদনা। কবিতার সময়কাল সন্ধ্যা। কবিতায় এ এক করুণ অনিবার্যতা। এ অনিবার্য অন্ধকারের পটভূমে কবি একটুখানি আলো চেয়েছেন যথাক্রমে নদী, তারা ও পাখির কাছ থেকে। কবির ভাষায়ঃ 'ও নদী,ও রহস্যময় নদী,/অন্ধকারে হারিয়ে যাসনে,একটু দাঁড়া;/এই যে একটু-একটু আলো,এই যে ছায়া ফিকে-ফিকে,/এরই মধ্যে দেখে নেব সন্ধ্যাবেলার প্রথম তারাটিকে।/ও তারা,ও রহস্যময় তারা,/একটু আলো জ্বালিয়ে ধর,দেখে রাখি/আকাশী কোন্ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে যায় দিকে-দিকে,/দেখে রাখি অন্ধকারে উড়ন্ত ওই ক্লান্ত পাখিটিকে।/ও পাখি,ও রহস্যময় পাখি।/হারিয়ে গেল আকাশ-মাটি,কান্না পাওয়া/এ কী করুণ সন্ধ্যা! এ কোন্ হাওয়া লেগে/অন্ধকারে অদৃশ্য ওই নদীর দুঃখ হঠাৎ উঠল জেগে।/ও হাওয়া,ও রহস্যময় হাওয়া!' কবি অন্যমনে বিকেলবেলার নদীটিকে ফিরে দেখতে চান। কবিতাটি বেদনাদীর্ণ অনুভূতির রং নিয়ে কিশোর মনে চারিয়ে যায়,'মাঠের সন্ধ্যা'-রূপ কোনো এক প্রাকৃতিক শোভা নয় বরং তার অনুষঙ্গে মানব মনের এক বিশেষ অনুভূতি সমেত কিশোর মনকে অনুভূতিপ্রবণ করে তোলে। **'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থের 'জুনের দুপুর' কবিতাটিকে অনায়াসে কিশোর ভাববৃত্তে রাখা যেতে পারে। কবিতায় দেখি প্লেন থেকে দেখা নীচের পৃথিবী। কবির ভাষায়ঃ** 'উপর থেকে নীচে তাকাও,দ্যাখো,/ছায়াছবির মতোই হঠাৎ/চোখের সামনে থেকে/এরোড্রামটা দৌড়ে পালায়/পৃথিবী যায় বেঁকে।/রইল পড়ে দশটা-পাঁচটা,/ঝাঁকড়া-মাথা মেপ্‌ল গাছটা,/চওড়া-ফিতে রাস্তাটা আর/নদীর নীলচে শাড়ি,/ফুলের বাগান,গির্জে,খামার,/ছক-কাটা ঘরবাড়ি।/উপর থেকে নীচে তাকাও, দ্যাখো,/লক্ষ লক্ষ টুকরো দৃশ্য/নতুন করে ভেঁজে/একটি অসীম রিক্ততাকে/তৈরি করল কে যে।/নোত্‌রদামের গির্জেটা আর/হোটেল,ক্যাফে,মস্ত টাওয়ার/মিলিয়ে দিচ্ছে মেঘের শান্ত/হাল্কা নীলের তুলি।/মিলায় মিলায় পারির প্রান্ত-/রেখার দৃশ্যগুলি।/উপর থেকে নীচে তাকাও,দ্যাখো,/দৃশ্যহারা দীর্ঘ দুপুর/সমস্ত দিক ধুধু,/জুনের আকাশ আপন মনে/রৌদ্র পোহায় শুধু।' **দৃশ্য বিভাজনে বর্ণনাত্মক হলেও কবি কবিতাটির নামকরণ করেছেন 'জুনের দুপুর'। এর কারণ সম্ভবতঃ লুকিয়ে আছে কবিতার শেষ স্তবকটিতে। যেখানে কবি বলেনঃ** 'কোথায় ফাটছে আগুন-বোমা,/কোথায় কাইরো,কোথায় রোমা!/শূন্য মোছায় দেখার ভ্রান্তি/নিত্যদিনের চোখে।' আসলে এ কবিতায় আছে এক 'বাইনারি এফেক্ট'। বাস্তবে দেখা পৃথিবী আর কবির দেখা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিটি তুলনাত্মক ভঙ্গিমায় ফুটে উঠেছে এ কবিতায়। পৃথিবীর সংকট আজ 'ওয়ার অ্যান্ড ইভাকুয়েশন', যেখানে যুদ্ধের তাতে কাঁপছে গোটা পৃথিবী! আর প্লেনে বসে, বহু উঁচু থেকে দেখা জুনের ক্লান্ত, তপ্ত দুপুরের নানা চলায়মান দৃশ্য—সেও একখণ্ড পৃথিবী, মূহুর্তে ও অনায়াসে যা পালটে দেয় দেশ ও মহাদেশের নানা প্রেক্ষাপট। তাই কবি অনায়াসে পৌঁছে যেতে পারেন ফুলের বাগান, গির্জে, খামার থেকে নোতরদামের গির্জে, হোটেল, ক্যাফের দ্রুতায়িত পট পরিবর্তনে। প্লেনে চড়ে পালটে যাওয়া পরিবর্তিত গোলার্ধের দৃশ্যায়িত পরিবর্তন খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু 'লক্ষ লক্ষ টুকরো দৃশ্য' কবি মনে ঘনীভূত হয়ে সেই দীর্ঘ জুনের দুপুরকে একসময় যখন 'দৃশ্যহারা' করে দেয়, তখন তাঁর মনে হয়ঃ 'জুনের আকাশ আপন মনে/রৌদ্র পোহায় শুধু।' শুদ্ধ প্রকৃতি হলো এই 'জুনের দুপুর—যা তার চেনা ছন্দে, চির পরিচিত নিয়মে—আকাশ থেকে শুরু করে গোটা পৃথিবী জুড়ে নিজেকে মেলে ধরে তার স্বাভাবিক গতিতেই, আর তার বিপরীতে আছে আর এক বিপন্ন, বিধ্বস্ত পৃথিবী—যা হিংসালিপ্সু আর যুদ্ধকামী মানুষের সৃষ্ট প্রকৃতি। অবাক ও উদ্বুদ্ধ কিশোরের চোখে নতুন পৃথিবী ও তার প্রকাশকে চিনিয়ে দেবার এ কাব্য-প্রয়াস অনন্য বৈ কী!

'নিজের বাড়ি' ('অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) কবিতাটি থেকে কিশোর-কিশোরীরা নতুন আঙ্গিকে অনুভব করতে পারে নিজের স্বভূমি আর আপন স্বাধীনতার টানকে। কবিতাটি একালে আরো বেশি প্রাসঙ্গিক এ কারণেই যে, আজকের স্বার্থান্ধ ও আত্মকেন্দ্রিক দুনিয়ায় স্বভূমি সহ স্বাধীনতার টান ও ভালোবাসা আসলে কেমন হওয়া উচিৎ তা বুঝিয়ে দেয় এ কবিতা। কবিতার পংক্তিগুলি এরূপঃ 'ভাবতে ভাল লেগেছিল, এই ঘর, ওই শান্ত উঠোন,/এই খেত, ওই মস্ত খামার-/সবই আমার।/এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি/ইচ্ছেমতন জানলা-দরজা খুলতে।/ইচ্ছেমতন সাজিয়ে তুলতে/শান্ত সুখী একান্ত এই বাড়ি।/ভাবতে ভাল লেগেছিল, চেয়ার টেবিল,/আলমারিতে সাজানো বই,/ঘোমটা-টানা নরম আলো,/ফুলদানে ফুল, রঙের বাটি,/আলনা জুড়ে কাপড়-জামার/সুবিন্যস্ত সমারোহ, সবই আমার।/এবং আমি ইচ্ছে হলেই পারি/দেয়ালে লাল/হলুদ রঙের কাড়াকাড়ি/মুছে ফেলতে সাদার শান্ত টানে।/এই যে বাড়ি, এই তো আমার বাড়ি।' **বোঝাই যায়, এই 'আমার' বলার মধ্যে কোনো আত্মকেন্দ্রিকতা নেই, বরং আছে এক গভীর ভাবাবেগ ও ভালোবাসা। আরো দ্রষ্টব্য, কবি গ্রাম বাংলার কথা বলেছেন। কবিতাটির নাম 'নিজের বাড়ি' হলেও কবিতার বর্ণনার পরিধি বাড়ি ছড়িয়ে উঠোন ও খামারে গিয়ে পৌঁছেছে, সুতরাং তা স্বভূমির আদর্শে আদর্শায়িত হয়ে উঠতে পেরেছে। তাৎপর্যপূর্ণ কবিতার শেষ লাইনগুলো, যেখানে কবি বলেনঃ** 'ভাবতে ভাল লেগেছিল, কাউকে কিছু না জানিয়ে/হঠাৎ কোথাও চলে যাব।/ফিরে এসে আবার যেন দেখতে পারি,/যে-নদী বয় অন্ধকারে, তারই বুকের কাছে/বাড়িটা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে।/ওই যে বাড়ি,ওই তো আমার বাড়ি।' এই অংশে 'কাউকে কিছু না জানিয়ে হঠাৎ কোথাও চলে যাওয়াটা' যেমন একার্থে কিশোর মনোবৃত্তির পরিচায়ক তেমনি 'ফিরে এসে অন্ধকারে বহতা নদীর বুকের কাছে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা' বাড়িটার পুনঃ আবিষ্কারও যেন কবিতাটিতে এক অন্তর্লীন বিষাদের সুরের জন্ম দেয়। **বিশেষতঃ যখন কবি কবিতাটিতে বারংবার 'ভাবতে ভাল লেগেছিল' রূপ পুরাঘটিত অতীতের ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করে যেতে থাকেন তখন অতীতের স্বভূমিতে ফিরে যাবার এক ভবিষ্য-মোহ ও আবেগ-বিপন্নতাও যেন চোরা স্রোতের মতো এ কবিতায় গোপনে তার অনুভূতিময় আপন কাজটি করে যায়।** 'চলন্ত ট্রেনের থেকে' কবিতাটিও 'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। আগের কবিতাটির মতো এ কবিতাটিতেও চলায়মান জীবন ধরা পড়েছে চলন্ত ট্রেনের জানালায় বসে দেখা ছবিতে। কবিতাটির বর্ণনা এরকমঃ 'চলন্ত ট্রেনের থেকে ধুধু মাঠ,ঘরবাড়ি এবং/গাছপালা,পুকুর,পাখি,করবীর ফুলন্ত শাখায়/প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে যতটুকু তৃপ্তি পাওয়া যায়,/সেইটুকুই পাওয়া। তার অতিরিক্ত কে দেবে তোমাকে।/দুই চক্ষু ভরে তবে দ্যাখো ওই সূর্যাস্তের রঙ/পশ্চিম আকাশে;দ্যাখো পুঞ্জিত মেঘের গাঢ় লাল/রক্ত-সমারোহ;দ্যাখো উন্মত্ত উল্লাসে ঝাঁকে-ঝাঁকে/সবুজ ভুট্টার খেতে উড্ডীন অসংখ্য হরিয়াল।... .../কর্মের আনন্দ দুঃখ দেখে নাও; আকাশের গায়ে/লগ্ন হয়ে আছে দ্যাখো প্রাণের প্রকাণ্ড লাল জবা।/সমস্ত পৃথিবী এসে দাঁড়িয়েছে ট্রেনের জানলায়।' কবিতাটি কিশোরদের কাছে আরো বেশি ভালো লাগবে এ কারণে যে ট্রেনের জানালা দিয়ে বাইরের জীবনের জলছবি দেখতে তারাই সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। 'প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে যতটুকু তৃপ্তি পাওয়া যায়,/সেইটুকুই পাওয়া। তার অতিরিক্ত কে দেবে তোমাকে।' কথা কয়টি তাৎপর্যপূর্ণ। জীবনে বাঁচার গতিকে আপন করে নেবার নির্যাস আছে এ কবিতায়, আছে এক ধনাত্মক জীবনাবেদন। 'ঘরোয়া স্টেশনে আঁকা চিত্রপটে করবীর ঝাড়' আর 'গৃহস্থের সচ্ছল সংসার' সেই জীবনেরই বাণী বহন করে চলে। এ কবিতা বড়দেরও অনুপ্রেরণা দেবে।

'খুকুর জন্য' কবিতাটি নীরেন্দ্রনাথের লেখা 'আজ সকালে' (১৯৭৮) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। ছোট্ট খুকুর সামান্য চাহিদা যেন অসামান্য ব্যঞ্জনা নিয়ে সমগ্র কবিতায় উপস্থিত। কবি যখন বলেনঃ 'খুকু,/ঘরে একটা জানলা চাই,বাইরে একটা মাঠ।/উঠোনে একটিইমাত্র কাঠ-/গোলাপের চারা/আস্তেসুস্থে বড় হোক,কিচ্ছু নেই তাড়া।/একদিন সকালে/নিশ্চয় দেখব যে,তার ডালে/ফুল ধরেছে।/খুকু,/আর-কিছু তো চাইনি,আমি চেয়েছি এইটুকু।' তখন তা যেন সাযূজ্যপূর্ণ হয়ে ওঠে কবিতার প্রথম লাইনগুলির সাথে যেখানে কবি বলেনঃ 'যার যেখানে জায়গা,যেন সেইখানে সে থাকে।/যা মনে রাখবার,যেন রাখে/নিতান্ত সেইটুকু।' এ যেন রবীন্দ্রনাথের বলা সেই 'ছোট প্রাণ ছোট কথা ছোট ছোট দুঃখ কথা'-র মতো। আসলে আমাদের এই অবিরাম ও অসীম চাহিদার দিনে কবি যেন এ কবিতার মধ্যে দিয়ে ছোটদের সংযমের শাসনে বাঁধতে চান। কোনো নীতিবাক্য নয় বরং সহজ সংলাপে 'সিম্পল লিভিং অ্যান্ড হাই

থিংকিং'-এর চিরায়ত সেই আপ্ত বাক্যটি আজকের দিনে ভূয়োদর্শী নীরেন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেই বা স্মরণ করিয়ে দিতে পারেন? কবিতাটি প্রায় তিনদশক আগে লেখা হলেও কবিতাটির ভাবসত্যটি এই মুহূর্তের ভোগবাদী সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আরো বেশি ধারালো হয়ে ওঠে।

'অঞ্জলিতে ছেলেবেলা' কবিতাটি কবির লেখা 'খোলা মুঠি'(১৩৮১) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। এ কবিতায় কবি নিজের ছেলেবেলাকে খুব নগণ্য বলেছেন কিন্তু তার আঙ্গিকটি অপরূপ। কবি যখন কবিতার প্রথমেই বলেনঃ 'এই তো আমার অঞ্জলিতেই মস্ত পুকুর,/কেউ আচম্‌কা/ছুঁড়লে ঢেলা/দেখতে থাকি কেমন করে প্রকাশ্য হয়/খুব নগণ্য ছেলেবেলা।' তখনই মনে হয়, এটি যেন এক সিল্যুয়েট, সিনেমাটিক্ ফ্ল্যাশব্যাকের মতোই রোল ব্যাক করে ছেলেবেলার পুনরাগমণ (অবশ্যই যার অস্তিত্ব এখন কবির জীবনে শুধুই স্মৃতিময়তায়) কবিতায় অনন্যস্বাদী। আসলে কবিতার এই প্রথম লাইনটি একটি 'কি লাইন'(Key Line) ধরে আবির্ভূত হয়। এ প্রসঙ্গে কবির সাক্ষাৎকারে দেওয়া একটি উত্তরের অবতারণা করা যায়। হাসমত জালালকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে 'তাঁর কবিতা অত্যন্ত সচেতন ও সতর্ক এক নির্মাণ কি না' এ প্রশ্নের উত্তরে কবি বলেনঃ 'দেখো, কবিতার প্রথম লাইনটা... ...একটা Key line—— কে জড়িয়ে কবিতাটা হয়ে ওঠে। এই Key line টা প্রথম লাইন বা মাঝের কোনও লাইনও হতে পারে। এই লাইনটা আচমকা পেয়ে যাই। ওটুকুর মধ্যেই মূল কবিতা। বাকিটা কারিগরি। একটা উদাহরণ দিই। প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটা কবিতা—'ছাদে যেও নাকো/ সেখানে আকাশ অনেক বড়/ সীমাহীন।' চমৎকার একটা ছবি। কিন্তু পরের লাইনগুলো দেখো— তারাদের চোখে এত জিজ্ঞাসা/ স্বপন সব হবে বিলীন। এটা কারিগরি।' এই কারিগরিকেই খুঁজে পাই 'অঞ্জলিতে ছেলেবেলা' কবিতায়। কবিতায় ছেলেবেলা, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যকে জলের বর্ণমালায় 'স্মৃতি' আর 'সময়' রূপে ফিরে পেতে চান কবি। কবিতার দ্বিতীয় স্তবকটিতে যখন কবি বলেনঃ 'দর্পণে মুখ লগ্ন রেখে ছোট্ট খুকুর/এখন দিব্যি কাটে সময়।/কাটুক,এখন হাওয়ায়/উড়ছে অনভ্যস্ত শাড়ির আঁচল,/অঞ্জলিতে টলটলে জল।' তখনই 'অঞ্জলিতে ছেলেবেলা'-র তাৎপর্যটি পূর্ণ হয়। কিন্তু তারপরই যখন কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবক জুড়ে কবি বলেনঃ 'পৌঢ় বোঝে পৌঢ়তা কী, বৃদ্ধ বোঝে/বয়স/বলতে কী ঝামেলা,/কিন্তু খুকু,এখন তুমি এতই অল্পবয়স্ক যে,/তোমার উপলব্ধিতে নেই ছেলেবেলা।/যখন থাকবে,তখন তুমি অনেক বড়,/কিন্তু,তখন আর-এক শীতে/নজর করলে দেখতে পাবে, কেমনতরো/জলের বর্ণ পালটে গেছে অঞ্জলিতে।' তখনই কিশোরী খুকুর চোখে পূর্ণ হয় জীবন। কিশোরীর চোখে ছেলেবেলা, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যকে স্মৃতি, সময়ের হাত ধরে মিলিয়ে দেবার এ এক অনন্য প্রচেষ্টা। কবিতায় আয়রনির মতো 'অঞ্জলি'-কে রেখে দেবার প্রসঙ্গটি গূঢ় তাৎপর্যবহ, বিশেষতঃ 'এই তো আমার অঞ্জলিতেই মস্ত পুকুর' কথা ক'টি গভীর তাৎপর্যবাহী। মনে রাখতে হবে, জলে অঞ্জলি দেবার ক্রিয়াটি মানবজীবনে অনেকবারই প্রতিপাদন করতে হয় কিন্তু তার উদ্দেশ্যটি সকলবারেই সমান নয়। আর সেই অঞ্জলির পথ ধরেই যখন কবি তাঁর 'খুব নগণ্য' ছেলেবেলায় পৌঁছতে চান তখনই তা সময়ের পটে সমগ্র জীবনের প্রতিই এক শ্রদ্ধাঞ্জলি হয়ে ওঠে, আর সেখানে 'জল' শুধু কবির ভাষায় বলা স্মৃতি আর সময়ই নয়, বরং অনেক অকথিত ব্যথা আর অনিঃসৃত অশ্রুগাথারও ভার বহন করে চলে। কবিতার প্রথম লাইনগুলিই অবশেষে ধুয়োর মতো শেষে আবারও ফিরে এসেছে।

'চিত্রমালা' কবিতাটি 'ঘর দুয়ার' (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাটি বেড়াতে যাবার আনন্দ নিয়ে লেখা। ট্রাভেল স্পট সিংভূম। কবিতাটি ছোটদের এ জন্যই আরো ভালো লাগবে, কারণ এর বর্ণনার কায়দা। কবিতার প্রথমেই আছে তার ইঙ্গিত। কবির ভাষায়ঃ 'গাঢ় নীল মেঘের/এলো খোঁপাটাকে খুলে ফেলতেই/নীচের মাটিতে/লাফিয়ে নামল/নদী।' এ বর্ণনাটিকেও আজকের টেকনোলজির যুগে ওয়েব ডিজাইনারের অথবা অ্যানিমেশনের ছোঁয়ায় কমপিউটারের মনিটরে ভেসে ওঠা জীবন্ত আর বাস্তব প্রকৃতির মতই মনে হয়। পার্থক্য শুধু একটাই। এতে এক বিন্দু কৃত্রিমতা নেই। কবিতায় 'লোহার-হৃদপিণ্ড-নিংড়ানো' রক্তবর্ণ জলের মধ্যে 'পোচড়া' ডুবিয়ে জঙ্গলের গায়ে ছিটিয়ে টকটকে লাল 'মোরগ-ফুল' ফোটানোর চিত্রটি ছান্দসিক কবি সত্যেন্দ্রনাথের 'ভোরাই' কবিতার কথা মনে করিয়ে দেয়। এ কবিতায় অদ্ভুতভাবে চিত্রকল্পের ব্যবহার করেন কবি। কবিতার

'চিত্রমালা' নামটিও সম্ভবতঃ ঐ কারণেই। ক্যানেস্তারা পিটিয়ে ধূমল-বর্ণ হাতির পালকে দিগন্তের দিকে ঠেলে তাড়িয়ে দেওয়ার সাথে সাথে পাহাড়ের জেগে ওঠার চিত্রকল্পটিও বিস্ময়াবিষ্ট কিশোরের চোখের সামনে আরণ্যক সিংভূমের আবিলতা তৈরী করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। কবিতার শেষে কবির সহাস্য সহজ হিউমারের ভঙ্গিমা ফুটে ওঠে যখন তিনি বলেনঃ 'ছবিটা আমার সাধ্যমত সাজিয়ে দিয়েছি।/তোমরা যারা ছুটিতে এবার/সিংভূমে বেড়াতে যাবে,/দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ো।' ভ্রমণ সুত্রটিকে কবিতায় অনবদ্য ভঙ্গিমায় তুলে ধরতে সফল কবি নীরেন্দ্রনাথ।

'ভরদুপুরে' কবিতাটি 'আর রঙ্গ' (১৯৯১) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। এর আগে 'জুনের দুপুর' কবিতায় তপ্ত-ক্লান্ত দুপুরের ছবি পাই। বোঝাই যায় মধ্যাহ্নের গুমোট আর বাতাসহীন ভ্যাপসা দিনকে যখন আপামর কবিকূল কবিতার পক্ষে ঘোর প্রতিকূল মনে করে প্রায় বর্জন করেন তখন নীরেন্দ্রনাথ তাকেই সাদরে তাঁর কবিতার বিষয় করে নেন। গরমে পোড়া গুমোট দুপুরের আনন্দ আর হাসি খুঁজে নেবার জন্যই যেন কিশোরকূলকে আলাপ করে কবি বলে ওঠেন এ কবিতায়ঃ 'এই,তোরা সব চুপ কেন রে?/আয় না হাসিঠাট্টা করে/পথের কষ্ট খানিক ভুলি।/কেউ হাসে না। ভরদুপুরে/আমরা দেখি আকাশ জুড়ে/উড়ছে সাদা পায়রাগুলি।'

'ও পাখি' কবিতাটি নেওয়া হয়েছে নীরেন্দ্রনাথের 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৩৮৩) কাব্যগ্রন্থ থেকে। 'খাঁচার পাখি' আর 'মনের পাখি'-র তুলনাকে এ কবিতায় ভার্চুয়ালি তুলে ধরতে চেয়েছেন কবি। কবিতার ধরতাইটা কিশোর মনের উপযোগী, যদিও তা থেকে ক্রমশঃ গভীরতর ভাবনায় পৌঁছেছেন কবি। শুরুটা এমনঃ 'ও পাখি,তুই কেমন আছিস,ভাল কি?/এই তোমাদের জিজ্ঞাসাটাই/মস্ত একটা চালাকি।/শূন্যে যখন মন্ত্রপড়া অস্ত্র হানো,/তখন তোমরা ভালই জানো,/আকাশটাকে-লোপাট-করা দারুণ দুর্বিপাকে/পাখি কেমন থাকে।' এই জিজ্ঞাসা যেন পাখিকেই নয়, মানুষকেও। বৃহত্তর অর্থে এ আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা। চারিদিকের আবিলতা আর মলিনতার ঘেরাটোপে বন্দী আমরা তো পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির মতই! সত্যিই আমরা ভালো আছি কি? কবিতার পরের অংশে কবি অবশ্য জীবনে বাঁচার আনন্দ খুঁজতে এক অন্যতর মানের সন্ধান দিয়েছেন। পাখি মুক্ত, অথচ সেই মুক্ত পাখিই 'নীল জ্বলন্ত অনাদ্যন্ত' (শব্দের ব্যবহার লক্ষণীয়) আকাশকেই তার বিরাট মুক্ততার গণ্ডিতে বাঁধতে চায়। অনবদ্য সেই তিনটি লাইন ব্যবহার করার লোভ সামলানো গেলোনা। তা হলোঃ 'নীল জ্বলন্ত অনাদ্যন্ত/আকাশকে তার সখ্যে/বাঁধতে যে চায়,সে কি পাখি,সে কি শুধুই পাখি?/খাঁচায় বসে এই কথাটাই ভাবতে থাকি।' তাহলে, কবির ইঙ্গিতী অর্থে মুক্ত পাখি তার ডানার মেজাজে, ঢেউ-লীন অনন্ত উড্ডীনতায় মুক্ত তো মুক্তই থাকলো—জগতের বাঁচা-মরার দৈনন্দিন ঘেরাটোপে বন্দী হয়ে গেলাম আমরাই। অথচ কবি উপরিউক্ত লাইনগুলিতেই একটি বাইনারী ইঙ্গিতও রাখলেন—'সে কি পাখি,সে কি শুধুই পাখি?' কথা কয়টির মধ্যে দিয়ে। 'পাখি' অথচ শুধুই 'পাখি' নয়? তবে আরও কি সে? অথবা আরও কি হতে পারে সে? খটকার উপশম ঘটে শেষ পংক্তিতে যেখানে কবি লেখেনঃ 'অন্যদিকে,তুমিও জানো,সত্যি-অর্থে বাঁচার/বিঘ্ন ঘটায়, তৈরি হয়নি এমন কোনো খাঁচা।/দুই নয়নের অতিরিক্ত একটি যদি নয়ন জ্বালো,/তবেই বুঝবে, এই না-ভালোর অন্ধকারেও আছি ভালো।/বুঝবে,সে কোন্ মন্ত্রে নিজের চিত্তটাকে মুক্ত রাখি।/মৃত্তিকাকে মেঘের সঙ্গে যুক্ত রাখি।' অসাধারণ এ লাইন কটি! সত্যিই তো বাঁচার মানে খুঁজে পেয়েছেন কবি। জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। ঈশ্বর তাকে পাখির মতো ডানা দেয়নি সত্য, কিন্তু কল্পনা, চিন্তাশক্তি আর মেধার পাখনা মেলা এমন একটা দুর্বার, উড্ডীন মন তো দিয়েছে—যেখানে সে দশ দিগন্তে, বিশ্বচরাচরে সর্বমুক্ত—সর্ব বাধা-বিঘ্নাতীত শক্তির অধিকারী! তাইতো তার এতো কল্পনা, এতো আবিস্কার আর হৃদয়ের এতো প্রসারতা! সংকটের সন্নিধানেও বাঁচা-মরার চক্রে টাল খেতে খেতে যে সর্ব বাধা অতিক্রম করে এগোতে চায় তাকে বাঁধবে কোন্ কালপিঞ্জর? এ সত্য উপলব্ধির, এ অভীপ্সার জোরকে বোঝা যায় তৃতীয় নয়ন অথবা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের ধীশক্তি দ্বারাই। কবি নিজেও তা বুঝেছেন—তাই তো তার বিঘ্নবিনাশী মন চারদিকের কুটিল কালো অন্ধকারেও বাঁচার মানে খুঁজে পায়, তাঁর মুক্ত চৈতন্য মাটির সাথে আকাশকে মেলানোর অনায়াস আনন্দ খুঁজে পায়। সীমা অসীমের মিলন তত্ত্ব আমরা রবীন্দ্রনাথের কথাতেই পেয়েছি আর একালের কবি নীরেন্দ্রনাথ মানুষের সেই মুক্ত চিত্ত অনিরুদ্ধের কথা

বললেন, যা শুধু কবিতার ভাষা নয়—জীবনেরও ভাষা! 'বুঝবে,সে কোন্ মন্ত্রে নিজের চিত্তটাকে মুক্ত রাখি।/মৃত্তিকাকে মেঘের সঙ্গে যুক্ত রাখি।' এই শেষ লাইন দুটিকে এ কবিতায় প্রবাদের মতো মনে হয়।

'এশিয়া' কবিতাটি কবির 'নীলনির্জন'(১৩৬১) কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া। এ কবিতায় কবির ভারত সহ সমগ্র এশিয়া স্তুতি আগত দিনের কর্ণধার কিশোর-কিশোরীদের প্রাণিত করবে। কবিতার মধ্যে এক গভীর বীরত্ব সহ দুর্বনীত শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লবী জনতার শাশ্বত প্রতিবাদ ও স্বাজাত্যবোধের বলিষ্ঠ প্রত্যয় মিশে আছে। কতকগুলি চরণঃ 'দুর্বিনীত দুরন্ত আদেশ শুনে কারো/দীর্ঘরাত্রি মরে যায়,ধসে পড়ে শীর্ণ রাজ্যপাট;/নির্ভয়ে জনতা হাঁটে আলোর বলিষ্ঠ অভিসারে ।/হে এশিয়া, রাত্রিশেষ,"ভস্ম অপমান শয্যা" ছাড়,/উজ্জীবিত হও রূঢ় অসংকোচ রৌদ্রের প্রহারে।/ শহরে বন্দরে/গঞ্জে,গ্রামাঞ্চলে,ক্ষেতে ও খামারে/জাগে প্রাণ,দ্বীপে দ্বীপে মুঠিবদ্ধ আহ্বান পাঠায়;/অগণ্য মানবশিশু সেই ক্ষিপ্র অনিবার্য ডাক/দুর্জয় আশ্বাসে শোনে,দৃঢ় পায়ে হাঁটে।' 'অগণ্য মানবশিশু' সম্বোধনে কবি আগত দিনের মানবের কথা বলেছেন যারা আজ বালক ও কিশোর। গঞ্জে, গ্রামে, ক্ষেতে ও খামারে তাদের কানে পৌঁছেছে সভ্যতার সেই অনিবার্য ডাক। দ্বীপে দ্বীপে পৌঁছেছে সেই মুষ্ঠিবদ্ধ আহ্বান। রাত্রির শিশির-সিক্ত মাঠ কেঁপেছে অস্থির আগ্রহে। রৌদ্রার্দ্র দিনের কঠিন কপাট ভেঙে পড়েছে তাদের বলিষ্ঠ প্রতাপে। কবিতায় 'হে এশিয়া,রাত্রিশেষ,"ভস্ম অপমান শয্যা" ছাড়' চরণটির ব্যবহার তাৎপর্যময়। অতীতের ম্লানিমাকে পরাহত করে দুর্দম আবেগে বাঁক ফেরার মন্ত্রোচ্চারণ এভাবেই সাধিত হয়েছে এ কবিতায়। দুর্জয় আশ্বাসে দৃঢ় পায়ে পথ হাঁটে সেই বীত-নিদ্র জনস্রোত, চিরন্তন বিদ্যুত্-উল্লাসে নেয় বাঁক—ভারতে, সিংহলে, ব্রহ্মে, ইন্দোচীনে, ইন্দোনেশিয়ায়—এশিয়ার সমগ্র কন্দরে। কবিতাটি ভাবোদ্দীপক। 'নীলনির্জন' কাব্যগ্রন্থের আর একটি কিশোর ভাবোদ্দীপক কবিতা হলো 'অমর্ত্য গান'। কবিতাটির মধ্যে দিয়ে কবি যে অর্মত্য গানের কথা বলেছেন তার টানে ছোট আশারা বাঁচে, বাঁচে ছোট ভালোবাসারা। তাই দিয়েই কবি ছোটদের হৃদয় ভরাতে বলেছেন, সাধারণ হয়ে—সাধারণের মধ্যে বেঁচে থেকে ছোট প্রাণ, ছোট আশা, ছোট দুঃখ ভালোবাসাকে সবাকারে ভাগ করে নিতে বলেছেন; হৃদয়ের দরজায় খিল তুলে দিয়ে অসাধারণের নামে উতলা, অস্বাভাবিক কোনো দুর্লভতাকে পেতে আর অলীক স্বপ্নসন্ধানী হতে নিরস্ত করেছেন ছোটদের। কবির কথায়ঃ 'সাধারণ,তুমি সাধারণ,তাই/ছোট আশা ভালবাসা—/তা-ই দিয়ে ছোট হৃদয় ভরাও,/তার বেশি যদি কিছু পেতে চাও/পাবে না,পাবে না,যাকে আজও চেনা/হল না,সর্বনাশা/সেই মায়াবীর গান ভুলে যাও,/ভুলো তার ভালবাসা।/সাধারণ,তুমি সাধারণ,তবু/অসাধারণের গানে/ভুলেছ; পুড়েছে ছোট ছোট আশা,/পুড়েছে তোমার ছোট ভালবাসা,/ছোট হাসি আর ছোট কান্নার/সব স্মৃতি সেই প্রাণে/বুঝি মুছে যায় যে-প্রাণ হারায়/সেই অমর্ত্য গানে।' কবিতাটির নাম 'অমর্ত্য গান' বিষয়বস্তু অনুসারী ও সার্থক। এ কবিতার মধ্যে তিরিশের দশকের বিদেশী কবি অডেন, স্পেন্ডার, লিউইসের ('পোয়েটিক ইমেজ'-এর স্রষ্টা) গদ্যের মতই গদ্যের একটা অসাধারণ ইমেজ আছে। আর কবি শঙ্খ ঘোষ তো বলেইছেন যে, নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় গদ্য গূঢ় কৌশলে এসেছে। বস্তুতঃই নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় যে কখনও কখনও শব্দ, ছন্দ, ব্যঞ্জনা এবং তার নির্মিতির ভিতরে সুসংহত গদ্যের অভিঘাত নেমে আসে তার সার্থক প্রমাণ এ কবিতাটি।

নীরেন্দ্রনাথ চক্রর্তীর 'চল্লিশের দিনগুলি'(১৯৯৪) কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত ছোটদের ভাবোদ্দীপক একটি অন্যতম কবিতা হলো 'বৃষ্টির পর'। কবিতাটিতে চল্লিশের বাস্তুহারা পৃথিবীর একটি ছায়াচিত্র অনুষ্ঠিত হয়েছে একটি বৃষ্টিস্নাত দিনের শেষে এক পাখির চিত্রকল্পে। চেনা পৃথিবী শহরের রেলিং ঘেরা বাতায়নে পূর্ণ নয়, তাই পাখি উড়াল দেয় আকাশে। কবির ভাষায়ঃ 'কিছুটা আলো কালো মেঘের/রেলিঙে ছিল ঝুঁকে।/কিছুটা ছিল আড়ালে,আর/কিছুটা সম্মুখে।/ছবিটা তবু পূর্ণ নয়,/খানিক ছিল বাকি,/পৃথিবী থেকে আকাশে তাই/উড়াল দেয় পাখি। আর তখনই চেনা পৃথিবী পাখির চোখে হয়ে যায় অচেনা। সে দেখে শ্রাবণসন্ধ্যায় দিনাবসানে মাঠকোঠায় দরজা ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে এক ঘরছাড়া গ্রাম্য গৃহবধূ। পোড়া কলকাতা শহর বাস্তুহারা পৃথিবীর কালিমা মেখেও যখন আলোয় ঝলমল করে তখনও সেই গ্রাম্য বধূর চোখে নিরাশার ম্লানিমা। অবাক পাখির চোখ দিয়ে চল্লিশের এ বাস্তুহারা ভূবনকে তুলে ধরেন কবি নগর ও গ্রামবাংলার এক পারস্পরিক বৈপরীত্যে। অতি বাস্তব এই বৈপরীত্য। বৃষ্টির পরে আঁকা রামধনু-

আকাশেও পাখি একা—ঠিক সেই হতাশ আর ফাঁকা চোখে চাওয়া গ্রাম্য বধূটির মতোই। কবিতার শেষ লাইনগুলিঃ 'আকাশে আলো ছড়িয়ে যায়,/বাতাস মধুময়।/নিরুচ্চার কে যেন বলে/চলছে : জয়,জয়!/যেখানে যায়,যেদিকে চায়,/আলোয় মাখামাখি।/সাঁজবেলায় আলোর জলে/সাঁতার কাটে পাখি।' কবিতাটি যেন ছোটদের চোখে আঁকা এক নিরুচ্চার বোধ ও বোধীর কবিতা। এ কবিতা ছোটদের কাছে চল্লিশের দিনগুলি সম্পর্কে প্রশ্ন জাগায়, জাগায় গভীর ভাবনা। কবিতায় 'কালো মেঘ' যদি হয় চল্লিশের অশান্ত সময় তবে 'বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যা' অবশ্যই তার পরবর্তী ম্লান পটভূমির দ্যোতক। চল্লিশের দামাল আলোড়নে কলকাতা শহরও পুড়েছে, তবু এত তাড়াতাড়ি তার সামলে ওঠা কিম্বা আলোর বাহার, বৈভব ও ঝলমলানির কৃত্রিমতা কবিকে অবাক করে, করে বিচলিত। বরং একলা পাখির দৃষ্টি দিয়ে দেখা বিরস, আকুল, ঘরছাড়া গৃহবধূটি কবির চোখে অনেক স্বাভাবিক আর জীবন্ত। পাখিকে এ কবিতায় কবি আত্ম-রূপক হিসাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। একই প্রেক্ষাপটে রাখতে পারি কবির 'আবহমান' কবিতাটিকে ('অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) যেখানে কবি বলেনঃ 'যা গিয়ে ওই উঠানে তোর দাঁড়া,/লাউমাচাটার পাশে।/ছোট্ট একটা ফুল দুলছে,ফুল দুলছে,ফুল/সন্ধ্যার বাতাসে।/কে এইখানে এসেছিল অনেক বছর আগে,/কেউ এইখানে ঘর বেঁধেছে নিবিড় অনুরাগে।/কেউ এইখানে হারিয়ে গিয়েও আবার ফিরে আসে,/এই মাটিকে এই হাওয়াকে আবার ভালবাসে।/ফুরোয় না তার কিছুই ফুরোয় না,/নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে,কিন্তু মুড়োয় না!' লাউমাচা আর ছোট্ট ফুলটা এখানে আবহমানতার প্রতীক, সেই-ই কাছে ডাকে, ভালোবাসে—পুরানো স্মৃতি, হারানো ভালোবাসাকে ফিরিয়ে দেয়। কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে পড়ে যেতে পারে দেশভাগের পর পুনরায় ফিরে পাওয়া দেশ-গাঁ-য়ের প্রতি নিগূঢ় টান আর বিষণ্ণ আবেগ বিধুরতার কথা যার সঙ্গে নবীন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীদের কথাচ্ছলে পরিচয় করিয়ে দিতে চান কবি। 'নেভে না তার যন্ত্রণা যে,দুঃখ হয় না বাসি,/হারায় না তার বাগান থেকে কুন্দফুলের হাসি/তেমনি করেই সূর্য ওঠে,তেমনি করেই ছায়া/নামলে আবার ছুটে আসে সান্ধ্য নদীর হাওয়া/ফুরোয় না,তার কিছুই ফুরোয় না,/নটেগাছটা বুড়িয়ে ওঠে,কিন্তু মুড়োয় না।'- কথা কয়টি কবিতায় এক যন্ত্রনাময় আবেগের জন্ম দেয়। ফিরে পাওয়া ছেলেবেলার স্মৃতি থেকে দেশভাগের যন্ত্রণা একালের প্রজন্মের কাছে সবকিছুরই সাক্ষাৎ দ্যোতনা বয়ে আনে এ কবিতা। এখানে একটা কথা বলা আবশ্যক। বহু কবিতাতেই দেখা যায় কবি কল্পনা অপেক্ষা বাস্তবকে বেশি গুরত্ব দেন, প্রকৃতির ছোট ছোট অনুষঙ্গগুলোকে সাজিয়ে তোলেন গভীর ভাবনার পটে আঁকা সংযোগী উপকরণ রূপে। কিন্তু এমন কেন? এ প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যায় কবির সাক্ষাৎকারকালীন কথোপকথন অংশে। সাক্ষাৎকারে দেওয়া এক প্রশ্নের উত্তরে কবি যখন বলেনঃ 'কবিতা কল্পনালতা'-য় আমি বিশ্বাস করি না। আমি এমন কোনও মানুষ নিয়ে লিখিনি যাকে আমি দেখিনি, যার কথা আমি শুনিনি বা যে আমার ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এমন কোনও রাস্তা নিয়ে আমি লিখিনি যার ধুলো আমাকে স্পর্শ করেনি। এমন কোনও গাছ নিয়ে লিখিনি যে গাছ আমি চিনি না। তবে কবিতার বাড়তি একটা ব্যাপার থাকে— যেটুকু বলছি, শুধু সেইটুকুই বলছি কি? যদি কবিতার মধ্যে বাড়তি কোনও ব্যঞ্জনা উঁকি না দেয়, তাহলে বুঝতে হবে সে লেখা হয়নি।' তখন মনে হয়—বৃষ্টি, পাখি, নদী—যেন এক একটা সাংকেতিক তাৎপর্য নিয়ে ধরা দেয় কবির কবিতায়, আর এ সব নিয়েই সম্পূর্ণ হয় তাঁর কবিতার আসল সমাজবাস্তবতা। আর সামাজিক দায়বদ্ধতা সম্পর্কেও কবির সাফ কথাঃ 'সামাজিক দায়বদ্ধতা, বিতর্ক-টিতর্ক, ওসব কাজের কথা নয়। একজন চাষী যখন লাঙল কাঁধে মাঠে চাষ করতে যায় বা একজন শ্রমিক যখন তার হেতের নিয়ে কারখানায় কাজ করে, তখন কি তারা সমাজের উপকার করছে বলে সেগুলো করে? তা তো নয়, তারা ওই কাজ করে তাদের জীবন ধারণের জন্য, খাওয়া-পরার জন্য। কিন্তু কাজগুলো এমনই যে তাতে সমাজের উপকার হয়। যে ভাল লোক, সে কারোর উপকার করতে না পারুক, অপকার তো করে না। কীটস্-এর কথা ধরো, তিনি কখনও সোশ্যাল কমিটমেন্টের কথা বলেননি, কিন্তু তাঁর কবিতা কি সমাজের কোনও অপকার করেছে? একজন কবি তাঁর নিজের মুক্তির কথা লিখছেন, তা পড়ে অন্যেরাও মুক্তি অনুভব করছে। কবি তো আর দেবী স্বরসতীর সঙ্গে দায়বদ্ধতার চুক্তি করে লিখতে বসছেন না। তবে কবির দায়বদ্ধতা থাকে কবিতার প্রতি, নিজের প্রতি। সাহিত্যের

শর্ত তাঁকে মানতে হয়। যারা সাহিত্যের শর্ত লঙ্ঘন করে, তারা সাহিত্যের ক্ষতি করে।' নীরেন্দ্রনাথের এই উক্তিরই সার্থক প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর প্রায় সকল কবিতায়।

কবির 'সহোদরা' কবিতাটি ('অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত) বোনের প্রতি ভাই-য়ের এক আবেগায়িত ভাবোন্মোচন। ভাই তার বোনকে আগলে রাখে পরম যতনে। নিজে সকল দুঃখ-কষ্ট, ব্যথা-যন্ত্রণা সয়লেও সে বোনকে ঘুম থেকে জাগায় না—বরং পরম আদরে তাকে আগলে রাখে। কবির ভাষায়ঃ 'না রে মেয়ে,নারে বোকা মেয়ে,/আমি ঘুমোবো না। আমি নির্জন পথের দিকে চেয়ে/এমন জেগেছি কত রাত।/এমন অনেক ব্যথা-আকাঙ্ক্ষার দাঁত/ছিঁড়েছে আমাকে! তুই ঘুমো দেখি,শান্ত হ'য়ে ঘুমো।/শিশিরে লাগেনি তার চুমো,/বাতাসে ওঠেনি তার গান। ওরে বোকা,/এখনও রয়েছে রাত্রি,দরজায় পড়েনি তার টোকা।' এখনও রৌদ্রের চুম্বন না লাগা শিশির ধোওয়া রাতে যেমন করে ঘুমায় জুঁই, বেল, টগর আর গন্ধরাজ ফুলেরা তেমনি করেই ভাই জানে, ঘুমায় খুকি বোন তার। তার বরণডালার মালাগাছি আগলে তাকে রক্ষা করে চলে ভাই। কবিতাটি পড়তে পড়তে 'সাত ভাই চম্পা'-র কথা মনে পড়ে যেতে পারে। নীরেন্দ্রনাথের লেখা 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' কাব্যগ্রন্থের একটি কবিতা হলো 'বাবুর বাগান'। বাবুর বাগান পাখিদের চারণভূমি, ছোটদের খেলাঘর আবার সিঁধেল চোরের চুরি করা সম্পদের বখরা লুকোনোর জায়গা। সেখানে ছোট শিশুদের হাত গলে ঘাসে পড়ে যায় তাদের এক-অপরের কাছ থেকে কেড়েকুড়ে আনা ফল-ফলারি, লোহার খাঁচা থেকে লুকিয়ে আনা পাখির খাবার, খেলার তুচ্ছ সামগ্রী। আর সে পাখির দানা ঠুকরিয়ে খায় মোরগ, শালিখের ছানায়। আবার বাটপাড়ের চুরি করে আনা মহার্ঘ সম্পদ রক্ষণের শ্রীক্ষেত্রও এই বাবুর বাগান। কবির ভাষায়ঃ 'সিঁদকাঠি হাতে গর্ত খুঁড়ছে/এই রাত্রে যে,তার/জানা নেই তারই পিছনে ঘুরছে/তিন জোড়া বাটপার।/যে সেখানে পারে,রাখে সেইখানে/কেড়ে-আনা টাকাকড়ি,/তাই দেখে হাসে বাবুর বাগানে শ্বেতপাথরের পরী।' একই বাবুর বাগান অথচ কত তার বিচিত্র রূপ! কবিতার শেষে বলাঃ 'তাই দেখে হাসে বাবুর বাগানে শ্বেতপাথরের পরী' লাইনটির মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন কৌতুক লুকিয়ে আছে।

কবির 'অন্ধকার বারান্দা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'বৃদ্ধের স্বভাবে' কবিতাটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বর্তমান আলোচনার ইতি টানবো। ছোট্ট কবিতা এটি। কবিতাটি পড়লে মনে হয় বৃদ্ধ কবি স্বয়ং নিজের এক স্বভাবের কথা বলছেন তাঁর নাতিকে। সে স্বভাবজ গল্পটি এমনঃ "এককালে আমিও খুব মাংস খেতে পারতুম,জানো হে;/দাঁত ছিল,মাংসে তাই আনন্দ পেতুম।/তোমার ঠানদিদি রোজ কব্জি-ডোবা/বাটিতে,জানো হে,/না না,শুধু মাংস নয়,মাংস মাছ ইত্যাদি আমায়/(রান্নাঘর নিরামিষ,তাই রান্নাঘরের দাওয়ায়)/সাজিয়ে দিতেন। আমি চেটেপুটে নিত্যই খেতুম।/সে-সব দিনকাল ছিল আলাদা,জানো হে,/হজমের শক্তি ছিল,রাত্তিরে সুন্দর হত ঘুম।" অথচ তারপরেই কবিতাটি কবি শেষ করেন এইভাবেঃ 'মুখ তুলে তাকিয়ে দেখি,রোগা ঢ্যাঙা বৃদ্ধ এক তার/পাতের উপরে দিব্য জমিয়েছে মাংসের পাহাড়।/যদিও খাচ্ছে না। শুধু মাংসল স্মৃতির তীব্র মোহে/ক্রমাগত বলে যাচ্ছে–'জানো হে,জানো হে'!' এক আশ্চর্য শিক্ষণীয় সমাপতন! আজকের প্রজন্মের কিশোর, তরুণ ও যুবকদের মধ্যে একটি বেপরোয়া প্রবৃত্তি হলো পরিবারে কিম্বা পরিবারের বাইরের বৃদ্ধদের অক্ষমতা নিয়ে তাঁদের অবজ্ঞা ও পরিহাস করা। অথচ আজকের দিনের সেই কিশোর, তরুণ ও যুবকরা বোঝেনা যে তারাও একদিন বৃদ্ধ হবে, অক্ষমতা একদিন গ্রাস করবে তাদেরও। আত্মবঞ্চনার ঢং-এ লেখা এ কবিতাটির মধ্যে দিয়েও কবি ছোটদেরকাছে এক চিরন্তন সৎ-শিক্ষার ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।

গ্রন্থ ও তথ্য ঋণ :

১. নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, মে ১৯৭০, কলকাতা।
২. 'কবিতা কল্পনালতা'-য় আমি বিশ্বাস করি না', নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, সাহিত্য ক্যাফে, কবি-লেখক সৈয়দ হাসমত জালালকে দেওয়া সাক্ষাৎকার, রবিবারের সকালবেলা, ৩০ অক্টোবর, ২০১১, কলকাতা।